CENTRE FOR HEALTH AND POPULATION RESEARCH

HSB
স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা

বর্ষ ৩ সংখ্যা ৪ | আইএসএসএন১৭২৯-৩৪৩এক্স | ডিসেম্বর ২০০৫

ভেতরের পাতায় . . .

৫ পুষ্টিহীন শিশুদের মানসিক বিকাশ ও আচরণের ওপর মানসিক ও সামাজিক উদ্দীপনার ফল: দৈবচয়নের ভিত্তিতে পরিচালিত একটি কন্ট্রোল ট্রায়াল

১০ কাজের জন্য স্বামীর আলাদা বসবাসের ফলে বিবাহিত পুরুষ এবং মহিলাদের ঝুঁকিপূর্ণ যৌন-আচরণ

১৬ সর্বশেষ সার্ভিলেন্স

খেজুর-রস থেকে নিপা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব

টাঙ্গাইল জেলার অন্তর্গত বাসাইল উপজেলায় আমরা একটি অনুসন্ধান চালিয়েছি, যেখানে ২০০৫ সালের জানুয়ারি মাসে মস্তিষ্ক প্রদাহ (এনসেফালাইটিস) রোগের প্রাদুর্ভাবে ১২ জন লোক আক্রান্ত হয়েছিলো। তাদের মধ্যে ১১ জন (৯২%) মারা যায়। তিন জনের রক্তের সিরাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিলো। ক্যাপচার ইম্মিউনোঅ্যাসে দ্বারা পরীক্ষায় এদের দু'জনের মধ্যে নিপা/হেন্দ্রা ভাইরাসের ইম্মিউনোগ্লোবুলিন এম (আইজিএম) এন্টিবডি পাওয়া যায়। যারা এ-রোগে আক্রান্ত হয় নি (কন্ট্রোল গ্রুপ) তাদের তুলনায় আক্রান্ত রোগীরা খুব সম্ভবত কাঁচা খেজুর-রস পান করে এ-রোগে আক্রান্ত হয়েছিলো [(রোগীদের মধ্যে ৬৪% বনাম কন্ট্রোল গ্রুপের মধ্যে ১৮%, অডস্ রেশিও ৭.৯, পি=০.০১)]। ফলখেকো বাদুড় (*টেরোপাস জাইগান্টাস*) খেজুর-রস সংগ্রহকারীদের কাছে সমস্যা সৃষ্টিকারী একটি প্রাণী, কারণ রস সংগ্রহ করার জন্য ব্যবহৃত মাটির পাত্র থেকে এরা রাতের বেলায় রস পান করে। এ-অনুসন্ধান থেকে নিপা ভাইরাস সংক্রমণের অন্য একটি পথ সনাক্ত করা হয়েছে যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে *টেরোপাস জাইগান্টাস* বাদুড়ের কাছ থেকে এ-ভাইরাস মানুষের শরীরে প্রবেশ করে।

২০০১ এবং ২০০৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশের মধ্য এবং পশ্চিম অঞ্চলে নির্ণীত নিপা ভাইরাসের চারটি প্রাদুর্ভাব স্বীকৃত হয়েছে (১,২,৩)। প্রত্যেকটি প্রাদুর্ভাবই জানুয়ারি এবং মে মাসের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। এই প্রাদুর্ভাবগুলো বিভিন্ন কারণে সংঘটিত হয়েছিলো। ২০০১ সালে মেহেরপুরে সংঘটিত নিপা ভাইরাসের প্রথম প্রাদুর্ভাবের সময় দেখা গেছে যে, যারা এ-রোগে আক্রান্ত হয় নি তাদের তুলনায় আক্রান্ত রোগীরা খুব সম্ভবত কোনো একটি অসুস্থ গরু এবং একজন অসুস্থ মানুষের দেহ থেকে নির্গত তরল পদার্থের সংস্পর্শে এসে আক্রান্ত হয়েছিলো (১)। ২০০৩ সালে নওগাঁয় সংঘটিত প্রাদুর্ভাবের সময় যারা নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত হয় নি তাদের তুলনায় আক্রান্ত রোগীদের (প্রাদুর্ভাবের পূর্বে) তাদের গ্রামের মধ্য দিয়ে যাওয়া একপাল শুকরের সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা বেশি বলে মনে হয়েছে (৪)। ২০০৪ সালে গোয়ালন্দে সংঘটিত নিপা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবে দেখা গেছে যে, যারা এ-ভাইরাসে আক্রান্ত হয় নি তাদের তুলনায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের গাছে ওঠা (যেসব গাছে বাদুড় ছিলো) এবং কোনো অসুস্থ ব্যক্তির সংস্পর্শে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিলো বেশ তাৎপর্যপূর্ণ (জে. মন্টগোমারী, ব্যক্তিগত যোগাযোগ)। ২০০৪ সালে ফরিদপুরে সংঘটিত প্রাদুর্ভাবের সময় মানুষের শরীরে নিপা রোগ সংক্রমণের প্রধান ঝুঁকি ছিলো অসুস্থ মানুষের সংস্পর্শে আসা (৩)।

আইসিডিডিআর,বি:
সেন্টার ফর হেলথ্ অ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ
জিপিও বক্স ১২৮
ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
www.icddrb.org

টেরোপাস জাইগান্টাস গোত্রভুক্ত এক ধরনের ফলখেকো বাদুড়কে বাংলাদেশে নিপা ভাইরাসের ধারক হিসেবে মনে করা হয়। নওগাঁয়ে পরিচালিত অনুসন্ধানে ১৯টি *টেরোপাস জাইগান্টাস* নমুনার মধ্যে দু'টিতে নিপা ভাইরাসের এন্টিবডি পাওয়া গিয়েছিলো। পরীক্ষিত অন্যান্য ৩১টি পশু-পাখির কোনোটির মধ্যেই নিপা ভাইরাসের এন্টিবডি পাওয়া যায় নি (১)। গোয়ালন্দে পশু-পাখির ওপর পরিচালিত অপেক্ষাকৃত বড় একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, *টেরোপাস জাইগান্টাস*-ই হচ্ছে একমাত্র প্রাণী যা নিপা ভাইরাস এন্টিবডির ধারক (ডারিন ক্যারল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ)।

২০০৫ সালের ১১ জানুয়ারি টাঙ্গাইল জেলার সরকারি স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছ থেকে জানা যায় যে, পূর্ববর্তী সপ্তাহে বাসাইল উপজেলার আট জন মানুষ, যারা ইতোপূর্বে ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলো, জ্বর এবং মানসিক অবস্থার পরিবর্তন-সংক্রান্ত অসুস্থতায় মারা যায়। বাংলাদেশ সরকারের অন্তর্গত ইনস্টিটিউট ফর ইপিডেমিওলোজি, ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ (আইইডিসিআর) অবিলম্বে একটি অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করে এবং পাঁচদিন পর তারা আইসিডিডিআর,বি-কে এ-গবেষণায় সাহায্য করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। এ-গবেষণার উদ্দেশ্য ছিলো প্রাদুর্ভাবের কারণ নির্ধারণ করা, অসুস্থতা সৃষ্টিকারী ঝুঁকিসমূহ কী কী তা খুঁজে বের করা এবং রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় কলা-কৌশল নির্ধারণ করা।

২০০৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর এবং ২০০৫ সালের ৩১ জানুয়ারির মধ্যে যে মানুষ বাংলাদেশে অবস্থিত টাঙ্গাইল জেলার অন্তর্গত বাসাইল উপজেলার হাবলা ইউনিয়নে বসবাস করতো বা সেখানে ভ্রমণ করেছে এবং জ্বরের সাথে নতুন করে তারমধ্যে খিঁচুনী অথবা মানসিক অবস্থার পরিবর্তন দেখা গেছে, গবেষকদল তাকে এ-প্রাদূর্ভাবের অন্তর্ভুক্ত এনসেফালাইটিস রোগী হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

একটি নৃবিজ্ঞানী (অ্যানথ্রোপোলোজি) দল ঘনিষ্ঠভাবে প্রতিটি রোগীর পরিবারের সাক্ষাৎকার নিয়েছে। উদ্দেশ্য ছিলো– স্থানীয় লোকজনের ভাষা এবং তাদের বোঝার ক্ষমতা (গবেষণার বিষয়সমূহ) বিবেচনা করে কেস-কন্ট্রোল প্রশ্নমালা তৈরি করা, রোগের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত সম্ভাব্য কোনো কারণ (এক্সপোজার) খুঁজে বের করা, এবং যেহেতু অধিকাংশ রোগী মারা গেছে, সেহেতু সঠিক বদলি উত্তরদাতা নির্বাচন করা।

নিবিড় গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে একটি মানসম্পন্ন প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়। প্রশিক্ষিত সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীদের দ্বারা প্রত্যেকটি রোগী অথবা তার বদলির(দের) নিকট থেকে প্রশ্নমালার উত্তর জেনে নেওয়া হয়। রোগীর বাড়ির সবচেয়ে নিকটে বসবাসকারীদের বাড়ি পরিদর্শনে গিয়ে যদি দেখা গেছে যে, তাদের বাড়িতে কেউ উক্ত রোগে আক্রান্ত হয় নি এবং ওই বাড়িতে রোগীর সমবয়সী কেউ আছে, তখন তাকে কন্ট্রোল গ্রুপের জন্য বাছাই করা হয়েছে। এরপর তার কাছ থেকে প্রশ্নমালার উত্তর জানার জন্য সম্মতি নেওয়া হয়েছে। যেসব রোগী মারা গেছে অথবা যারা প্রশ্নের উত্তর দিতে অপারগ ছিলো তাদের ক্ষেত্রে বদলি উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়।

ইম্মিউনোগ্লোবুলিন এম ক্যাপচার ইম্মিউনোঅ্যাসে দ্বারা নিপা/হেন্দ্রা আইজিএম এন্টিবডি এবং পরোক্ষ (ইন্ডাইরেক্ট) ইআইএ দ্বারা নিপা/হেন্দ্রা আইজিজি এন্টিবডি পরীক্ষা করার জন্য সিরামগুলো শুকনো বরফে (ড্রাই আইস) আচ্ছাদিত করে আমেরিকার সেন্টারস্ ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন-এ পাঠানো হয়।

প্রাদুর্ভাবের সাথে সম্পর্কিত এনসেফালাইটিসের লক্ষণসম্বলিত ১২ জন রোগী ছিলো। রোগীদের মধ্যে যেসব লক্ষণ দেখা গেছে সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিলো অজ্ঞান হয়ে যাওয়া (সারণি ১)। তাদের মধ্যবর্তী (মেডিয়ান) বয়স ছিলো ১৬ বছর (রেঞ্জ = ৫-৮৫) এবং সাতজন (৫৮%) ছিলো

সারণি ১: ২০০৫ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশের হাবলা ইউনিয়নে সংঘটিত এনসেফালাইটিস-এর সাথে সম্পর্কিত প্রাদুর্ভাবে আক্রান্তদের রোগের লক্ষণসমূহ

লক্ষণসমূহ	রোগীর সংখ্যা (%)
জ্বর	১২ (১০০)
অচেতনতা	৯ (৭৫)
খিঁচুনী	৪ (৩৩)
মাথাব্যাথা	৫ (৪২)
বমি-হওয়া	৫ (৪২)
শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া	১ (৮)
মৃত্যু	১১ (৯২)

পুরুষ। এ-রোগে আক্রান্ত ১১ জন (৯২%) রোগী মারা গেছে। অসুস্থ হওয়ার প্রথম লক্ষণ প্রকাশিত হওয়ার গড়ে চারদিন পর (রেঞ্জ = ২-৯) রোগীদের মৃত্যু হয়েছে। একজন রোগী অসুস্থ হওয়ার দু'সপ্তহের মধ্যে সবগুলো রোগী অসুস্থ হয়ে পড়ে (চিত্র ১)।

যাদের মধ্যে প্রাদুর্ভাবের সাথে সম্পর্কিত এনসেফালাইটিসের লক্ষণ দেখা গেছে তাদের তিনজনের কাছ থেকে রক্তের সিরাম সংগ্রহ করা হয়। ক্যাপচার এনজাইম ইম্মিউনোঅ্যাসে দ্বারা পরীক্ষায় তাদের দু'জনের মধ্যে নিপা/হেন্দ্রা ভাইরাসের আইজিএম এন্টিবডি পাওয়া গেছে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীগণ এনসেফালাইটিসের লক্ষণসম্বলিত ১১ জন রোগী এবং কন্ট্রোল গ্রুপ থেকে তাদের সমবয়সী ৩৩ জনকে গবেষণার জন্য নথিভুক্ত করেছেন। ওদের মধ্য থেকে একজন রোগীকে বাদ দেওয়া হয়েছে, কারণ তার রোগ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করার মতো সঠিক জ্ঞানসম্পন্ন কোনো বদলি উত্তরদাতা পাওয়া যায় নি। রোগীদের সবার জন্য এবং কন্ট্রোল গ্রুপের ছয়জনের (১৭%) জন্য বদলি উত্তরদাতা নেওয়া হয়েছে।

চিত্র ১: বাংলাদেশের হাবলা ইউনিয়নে সংঘটিত এনসেফালাইটিস প্রাদুর্ভাবে আক্রান্ত রোগীদের অসুস্থতা শুরু হওয়ার তারিখসমূহ

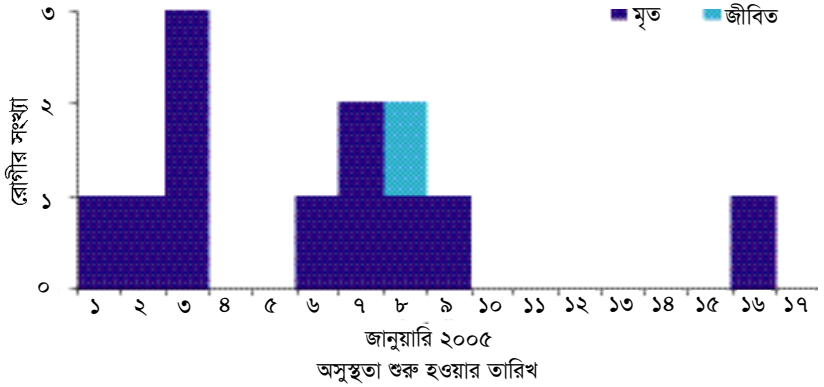

অসুস্থতার সাথে উল্লেখযোগ্যভাবে সম্পর্কিত একমাত্র যে কারণ (এক্সপোজার) সম্পর্কে জানা গেছে, তা হলো খেজুর-রস পান করা (রোগীদের ক্ষেত্রে ৬৪% বনাম কন্ট্রোল গ্রুপের ১৮%, অডস্ রেশিও ৭.৯, পি=০.০১)। যে ১৩ জন খেজুর-রস পান করেছিলো বলে জানা গেছে, তাদের ১১ জন জানতো কোথা থেকে রস সংগ্রহ করা হয়েছিলো। দশজন (৯১%) বলেছে যে, এ-রস একটিমাত্র

খেজুর-রস সংগ্রহকারীদের কাছ থেকে জানা যায় যে, মৌসুমের শুরুতে প্রত্যেকটি গাছের মাথার একপাশ থেকে কিছু কাণ্ড ফেলে দিয়ে সেখানে কেটে রস বের করা হয়। সেই রস সংগ্রহ করার জন্য একটি মাটির পাত্র ঝুলানোর ব্যবস্থা করা হয় এবং কাটা অংশ থেকে যাতে পাত্রের মধ্যে রস এসে জমা হয় সেজন্য কাটা অংশের নিচে একটি নল লাগানো হয় যার খোলা প্রান্ত পাত্রের মুখে থাকে। খেজুর-রস সংগ্রহকারীরা সন্ধ্যার সময় এ-কাজটি করেন এবং খুব ভোরে বিতরণের ঠিক পূর্বে তারা গাছ থেকে রস-ভর্তি মাটির পাত্রটি নামিয়ে আনেন। টাটকা খেজুর-রস খুব ভোরে বিক্রি করা হয়। এটি কয়েক ঘণ্টা ধরে রাখলে আস্তে আস্তে ঘোলা হয়ে যায় এবং এর মিষ্টি স্বাদ লোপ পায়। খেজুর গাছের মালিকদের কাছ থেকে জানা যায় যে, তারা এই ফলখেকো বাদুড়কে সমস্যা সৃষ্টিকারী একটি প্রাণী হিসেবে জানে, কারণ এগুলো প্রায়শই সরাসরি নল থেকে অথবা পাত্র থেকে রস পান করে। রসভর্তি মাটির পাত্রটির গায়ে অথবা রসের মধ্যে বাদুড়ের মল দেখা যাওয়া একটি সাধারণ ব্যাপার।

প্রতিবেদক: ইনস্টিটিউট ফর ইপিডেমিওলোজি, ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং ক্লিনিক্যাল সায়েন্সেস ডিভিশন ও হেলথ সিস্টেমস অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেজ ডিভিশন, আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকুল্য: ইনস্টিটিউট ফর ইপিডেমিওলোজি, ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা; সেন্টারস্ ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন, আটলান্টা, ইউএসএ এবং ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা

মন্তব্য

পাঁচ বছরের মধ্যে এটি পঞ্চম নিপা প্রাদুর্ভাব যা বাংলাদেশের একই অঞ্চলে সংঘটিত হয়েছে। প্রত্যেকটি প্রাদুর্ভাবই সংঘটিত হয়েছে জানুয়ারি এবং এপ্রিলের মধ্যে। বাংলাদেশের সর্বত্রই *টেরোপাস জাইগান্টাস* গোত্রভুক্ত বাদুড়ের অবাধ বিচরণ রয়েছে (৫)। বছরের এই সময়ে এ-অঞ্চলে নিপা প্রাদুর্ভাব সংঘটিত হওয়ার কারণ সম্ভবত *টেরোপাস জাইগান্টাস* বাদুড়দের এটি গর্ভ এবং প্রসবকালীন সময় যখন ওদের থেকে নিপা ভাইরাস নির্গত হওয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং/অথবা বছরের এই নির্দিষ্ট মৌসুমে এ-অঞ্চলের নির্দিষ্ট কোনো প্রাকৃতিক বা কৃষিজাত খাবারের আকর্ষণে (যেসব খাবার মানুষ খায়) ওরা এখানে ছুটে আসে।

বিশেষ করে এই প্রাদুর্ভাবের সময় বেশিরভাগ নিপা সংক্রমণের বাহন ছিলো সম্ভবত খেজুর-রস। তাছাড়া খেজুর-রস জৈবিকভাবে নিপা ভাইরাস সংক্রমণের একটি যুক্তিসংগত মাধ্যম। টাটকা খেজুর-রস পান করা ছিলো একমাত্র কারণ যা অসুস্থতার সাথে তাৎপর্যপূর্ণভাবে সম্পর্কিত ছিলো। বাদুড়ের মুখের লালা এবং মূত্র থেকে নিপা ভাইরাস নির্গত হয় (৬)। টাটকা খেজুর-রস যেহেতু সংগ্রহ করার অল্পক্ষণের মধ্যেই বিক্রি এবং পান করা হয়, সেহেতু কোনো ভাইরাস এমনকি যা এর ধারক থেকে বাইরে বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারে না, তাও পরবর্তীতে ছড়িয়ে পড়ার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে টিকে থাকতে সক্ষম বলে মনে হয়। বস্তুতঃ একটিমাত্র *টেরোপাস জাইগান্টাস* বাদুড়ের মাধ্যমে একবার একটিমাত্র পাত্রের রস সংক্রামিত হয়ে একটি বড় ধরনের প্রাদুর্ভাব সংঘটিত হতে পারে।

টাটকা খেজুর-রস সারাদেশব্যাপী একটি সুস্বাদু পানীয় যা শীত মৌসুমে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ পান করে। দৃশ্যতঃ অধিকাংশ স্থানেই টাটকা খেজুর-রস একটি নিরাপদ পানীয়। তবে আলোচ্য অনুসন্ধান থেকে জানা যায় যে, অন্ততঃপক্ষে মাঝে-মধ্যে এ-রসের মধ্যে পর্যাপ্ত নিপা

ভাইরাসের সংক্রমণ থাকে যা মানুষের মৃত্যুর কারণ ঘটায়। কত ঘন ঘন নিপা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব সংঘটিত হয় তা জানার জন্য আরো গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। যারা এভাবে নিপা সংক্রমণের হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে চায়, তাদের উচিত কাঁচা খেজুর-রস পান করা থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখা। রস সংগ্রহের পাত্র এবং নল থেকে ফলখেকো বাদুড়কে রস পানে বিরত রাখার কৌশলসম্বলিত স্বল্প খরচের ইন্টারভেনশন কর্মসূচির মাধ্যমে খেজুর-রসকে একটি অধিকতর নিরাপদ পানীয় হিসেবে রাখা যায় কি না তা পরীক্ষা করে দেখা উচিত।

এ-প্রাদুর্ভাব থেকে আরো জানা যায় যে, বাংলাদেশে মানুষের মধ্যে নিপা-সংক্রমণ একটি মৌসুমি রোগ, যা *টেরোপাস জাইগান্টাস* গোত্রভুক্ত এক শ্রেণীর ফলখেকো বাদুড়ের সাথে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে মানুষের মধ্যে ছড়ায়। প্রাদুর্ভাবসমূহ থেকে সনাক্তকৃত রোগ সংক্রমণের বিভিন্ন মাধ্যম থেকে জানা যায় যে, ফলখেকো বাদুড় থেকে মানুষের মধ্যে এ-ভাইরাস ছড়ানোর কতিপয় পথ আছে। বিকল্প পথগুলো কী কী তা জানা এবং তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ কলা-কৌশল উদ্ভাবনের জন্য আরো গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া উচিত।

তথ্যসূত্রের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন।

পুষ্টিহীন শিশুদের মানসিক বিকাশ এবং আচরণের ওপর মানসিক ও সামাজিক উদ্দীপনার ফল: দৈবচয়নের ভিত্তিতে পরিচালিত একটি কন্ট্রোল ট্রায়াল

শৈশবের প্রারম্ভের পুষ্টিহীনতা শিশুদের স্বল্প মানসিক বিকাশের সাথে সম্পর্কিত। মানসিক ও সামাজিক উদ্দীপনা (যেমন– খেলাধুলা) এ-ধরনের শিশুদের মানসিক বিকাশে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। কমিউনিটি পুষ্টিকেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ সমন্বিত পুষ্টি কর্মসূচি'-র অধীনে পুষ্টিহীন শিশুদের পুষ্টির যোগান দেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় পুষ্টিহীন শিশুদের মানসিক ও সামাজিক উদ্দীপনা দেওয়ার জন্য দৈবচয়নের ভিত্তিতে আমরা ১০টি পুষ্টিকেন্দ্র এবং ১০টি কন্ট্রোল[১] কেন্দ্র নির্বাচন করি। যেসব পুষ্টিহীন শিশুকে উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদান করা হয়েছে তাদের মানসিক বিকাশ ছিলো উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি এবং তুলনামূলকভাবে তারা ছিলো অনেক বেশি হাসি-খুশি, বন্ধুবৎসল, সহযোগিতাপূর্ণ এবং কথা বলায় সাবলীল। বাংলাদেশে পরিচালিত পুষ্টিসেবা কার্যক্রমের সাথে সমন্বিত শিশু-বিকাশ কর্মসূচি থেকে প্রমাণিত হয় যে, এটি পুষ্টিহীন শিশুদের মানসিক ও আচরণগত বিকাশের জন্য একটি কার্যকর উপায়।

বাংলাদেশে ৩০% শিশু স্বল্প ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে (<২৫০০ গ্রাম), ৪৮%-এর বয়সের তুলনায় মধ্যম অথবা মারাত্মক পর্যায়ের স্বল্পপুষ্টি (আন্ডারনিউট্রিশন) থাকে, উচ্চতার তুলনায় ১০%-এর ওজন কম থাকে (ওয়েস্টিং) এবং ৪৫%-এর বয়সের তুলনায় উচ্চতা কম (স্টান্টিং) থাকে (১)। অনেক ক্রস-সেকশনাল এবং দীর্ঘমেয়াদী গবেষণায় দেখা গেছে যে, শৈশবের প্রারম্ভের পুষ্টিহীনতার সাথে পরবর্তীতে তাদের মানসিক বিকাশ এবং লেখাপড়ার ফলাফলের একটি যোগসূত্র রয়েছে (২)। শিশুদের মানসিক ও সামাজিক উদ্দীপনা-সংক্রান্ত কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে, মানসিক ও সামাজিক উদ্দীপনা প্রদানের ফলে পুষ্টিহীন শিশুদের মানসিক বিকাশ ঘটে এবং লেখাপড়ায়ও তারা ভাল করে (৩,৪,৫)। তবে এ-ধরনের ইন্টারভেনশন বাংলাদেশে পরিচালিত হয় নি, যেখানে প্রায় অর্ধেক শিশুই পুষ্টিহীনতায় ভুগছে এবং শিশুদের সুষ্ঠু মানসিক বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ খেলাধুলা এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রতি তাদের পিতা-মাতার খুব কম উৎসাহ আছে (৬)। বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ সমন্বিত পুষ্টি কর্মসূচি চালু করেছে এবং এর মাধ্যমে পুষ্টিহীন শিশুদের পুষ্টি-

[১] যেসব কেন্দ্রে শিশুদের পুষ্টি বা উদ্দীপনা দেওয়া হয় নি

চাহিদা মিটানোর জন্য প্রয়োজনীয় প্যাকেট খাদ্য সরবরাহ করেছে। এই কর্মসূচির আওতায় আমরা পুষ্টিহীন শিশুদের নিয়ে একটি গবেষণা পরিচালনা করি, যার উদ্দেশ্য ছিলো বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে কম খরচে পুষ্টিহীন শিশুদেরকে মানসিক ও সামাজিক উদ্দীপনা প্রদানের মাধ্যমে তাদের মানসিক বিকাশ সম্ভব কি না তা পরীক্ষা করা।

যেসব কমিউনিটি পুষ্টিকেন্দ্রে সহজে যাতায়াত করা যায়, এমন ২০টি কেন্দ্র আমরা দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করি। প্রত্যেক পাঁচটি উপযুক্ত ইউনিয়ন থেকে চারটি করে কেন্দ্র নেওয়া হয়েছে এবং এই ২০টি কেন্দ্রকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলোর ১০টি রাখা হয়েছে ইন্টারভেনশন গ্রুপে এবং বাকি ১০টি কন্ট্রোল গ্রুপে। পূর্বনির্ধারিত সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রতিটি গ্রুপে ১০০ জন শিশু নেওয়ার জন্য পুষ্টিকেন্দ্রসমূহে আগত ৬-২৪ মাস-বয়সী সব পুষ্টিহীন শিশুকে আমরা তালিকাভুক্ত করি। যেসব পুষ্টিকেন্দ্রে গ্রামের সব শিশুর ওজন রেকর্ড করা হয় সেসব পুষ্টিকেন্দ্র থেকে পর্যাপ্ত পুষ্টিসমৃদ্ধ এবং নির্ধারিত বয়স ও লিঙ্গের সাথে খাপ খায় এমন ১০০ জন শিশুকে দ্বিতীয় কন্ট্রোল গ্রুপ হিসেবে নির্বাচন করা হয়। তাদের সবধরনের বিকাশের তারতম্য পর্যবেক্ষণের জন্য গবেষণা করা হয়। কিন্তু তাদেরকে উদ্দীপনা কর্মসূচিতে আনা হয় নি।

শিশুদের খেলাধুলা পরিচালনা করার জন্য স্থানীয় মহিলাদের মধ্য থেকে প্রশিক্ষক নির্বাচন করে তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যাতে তাঁরা শিশুদেরকে উদ্দীপনা প্রদান করতে পারেন এবং শিশুদের উদ্দীপনা প্রদানের জন্য তাদের মায়েদেরকেও সাহায্য করতে পারেন। এক বছর ধরে ইন্টারভেনশন চলাকালীন সময়ে খেলার প্রশিক্ষকগণ প্রথম আটমাস সপ্তাহে দু'দিন করে এবং পরবর্তী চারমাস সপ্তাহে একদিন করে প্রত্যেক মা এবং শিশুর সাথে তাদের বাড়িতে সাক্ষাৎ করেন। এ-সাক্ষাতের স্থায়ীত্বকাল ছিলো একঘন্টা। তাঁরা পুষ্টিকেন্দ্রে মায়েদেরকে নিয়ে প্রথম দশমাস সাপ্তাহিক এবং পরবর্তী দু'মাস পাক্ষিক সভাও করেছেন। শিশুদেরকে প্রশংসা করা, তাদের সাথে গল্প করা, তাদের প্রতি ভালবাসা ও মায়া-মমতা প্রদর্শন করা, তাদেরকে খেলাধুলা ও নতুন কিছু শেখার সুযোগ করে দেওয়া এবং আনন্দ দিয়ে শেখানোর গুরুত্ব সম্পর্কে মায়েদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে মানানসই কমদামী খেলনা ব্যবহার করে শিশুদের জন্য বয়সভিত্তিক পাঠ্যক্রম তৈরি করা হয়। গবেষণার শুরুতে এবং শেষে একটি শিশু বিকাশ স্কেল ব্যবহার করা হয় যার নাম 'বেলে স্কেলস অব ইনফ্যান্ট ডেভেলপমেন্ট' (পরিবর্তিত সংস্করণ) এবং এর দ্বারা শিশুর মানসিক ও সাইকোমটরের বিকাশ পরিমাপ করা হয় (৭) এবং ওক-এর 'বিহ্যাভিয়ার রেটিং স্কেল' ব্যবহার করে পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে শিশুদের আচরণ পরিমাপ করা হয় (৮)। এ-সময়ে শিশুদের পাঁচ ধরনের আচরণ পর্যবেক্ষণ করা হয়। যথা– নড়াচড়া, পরীক্ষকের প্রতি সাড়া দেওয়া, পরীক্ষা পদ্ধতির সাথে সহযোগিতা, আবেগীয় অবস্থা এবং সাবলীলভাবে কথা বলা। শিশুর আচরণের ওপর ভিত্তি করে প্রত্যেকটি স্তরে এক থেকে নয় পর্যন্ত ফলাফলসম্বলিত নম্বর থাকে।

তালিকাভুক্তির সময় পুষ্টিহীন শিশুদের তুলনায় পর্যাপ্ত পুষ্টিসমৃদ্ধ শিশুদের মানসিক বিকাশের সূচক বেশি ছিলো (পি=০.০৬) এবং তাদের সাইকোমটরের বিকাশও ছিলো উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি (পি=০.০০১) (চিত্র ১)। গবেষণায় অন্তর্ভুক্তির সময় পুষ্টিহীন দু'টি গ্রুপের মধ্যে তাদের মানসিক ও অন্যান্য বিকাশজনিত কোনো পার্থক্যই পরিলক্ষিত হয় নি। কোনো গ্রুপের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য কোনো আচরণগত ব্যবধান দেখা যায় নি। গবেষণার শেষে সব গ্রুপের শিশুদের মানসিক বিকাশ কমে গিয়েছিলো। কিন্তু ইন্টারভেনশনের আওতাভুক্ত শিশুদের মধ্যে এই মানসিক বিকাশ যতটুকু হ্রাস পেয়েছে (১.৮ পয়েন্ট) তার সাথে বেজলাইনে অন্তর্ভুক্তির সময়ের অবস্থার তেমন উল্লেখযোগ্য

পার্থক্য ছিলো না। অথচ কন্ট্রোল গ্রুপের পুষ্টিহীন (৭.৪ পয়েন্ট) এবং পর্যাপ্ত পুষ্টিসমৃদ্ধ (৩.৮ পয়েন্ট) শিশুদের বিকাশ বেজলাইনে অন্তর্ভুক্তির সময়ে যা ছিলো তা থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছিলো (চিত্র ১)। তিনটি গ্রুপের সবগুলোতেই শিশুদের সাইকোমটরের বিকাশ লাভ করেছে। তবে পর্যাপ্ত পুষ্টিসমৃদ্ধ এবং পুষ্টিহীন গ্রুপের তুলনায় ইন্টারভেনশন গ্রুপের শিশুদের বিকাশ ছিলো বেশি (ইন্টারভেনশন ১০.১ [(পি=০.০০১), পর্যাপ্ত পুষ্টিসমৃদ্ধ ৪.৭ (পি=০.০৫) এবং পুষ্টিহীন ৩.৭ পয়েন্ট (পি=০.০৭) (চিত্র ২)]। আমরা যেহেতু ২০টি গ্রামে কাজ করেছি এবং বিভিন্ন গ্রামের শিশুদের মানসিক বিকাশ ভিন্ন হতে পারে এজন্য অন্যান্য উপাদানকে নিয়ন্ত্রিত করে শুধুমাত্র পুষ্টিহীন দু'টি গ্রুপের ইন্টারভেনশনের প্রভাব নিরূপণের জন্য মাল্টিলেভেল মাল্টিপল রিগ্রেশন এনালাইসিস ব্যবহার করি (৯)। মডেল হিসেবে আমরা বেজলাইন থেকে প্রাপ্ত ফলাফল (স্কোর), বয়স, বাবার শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং ইন্টারভেনশন (ট্রিটমেন্ট) গ্রুপ-সম্পর্কীত বিষয়াবলি নিয়ন্ত্রণ করেছি। কন্ট্রোল গ্রুপের তুলনায় ইন্টারভেনশন গ্রুপে মানসিক এবং সাইকোমটর বিকাশের বৃদ্ধি (সূচি) দেখা গেছে যথাক্রমে ৪.৮ পয়েন্ট (পি=০.০২) এবং ৩.৩ পয়েন্ট (পি=০.১)। শিশুদের পুষ্টি-সংক্রান্ত অবস্থা যখন কন্ট্রোল করা হয়, তখন দেখা যায় যে, সাইকোমটর বিকাশের জন্য আরোপিত মানসিক-সামাজিক উদ্দীপনার ফলাফল বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পরিসংখ্যানগতভাবে একটি তাৎপর্যপূর্ণ পর্যায়ের কাছাকাছি পৌঁছেছে (বি=৪.২, এসই=২.২, পি=০.০৬)।

চিত্র ১: মূল্যায়নের সময় তিনটি গ্রুপের শিশুদের মানসিক বিকাশের সূচি (এমডিআই)

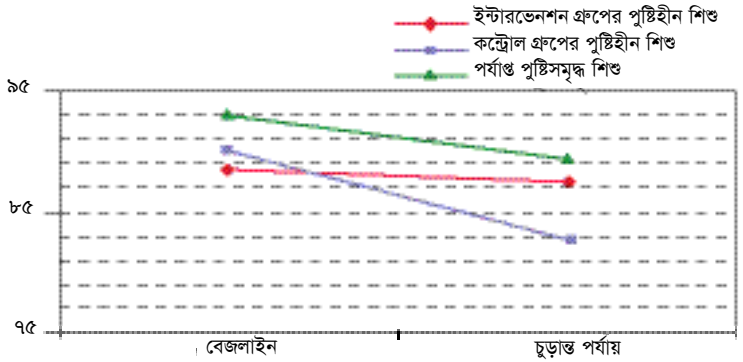

বেজলাইন: পর্যাপ্ত পুষ্টিসমৃদ্ধ এবং পুষ্টিহীন গ্রুপসমূহের মধ্যে যৌথভাবে মানসিক বিকাশ ছিলো পি=০.০৬ এবং দু'টি পুষ্টিহীন গ্রুপের মধ্যে তা তাৎপর্যপূর্ণ ছিলো না

চূড়ান্ত পর্যায়: কন্ট্রোল ও পর্যাপ্ত পুষ্টিসমৃদ্ধ গ্রুপের মধ্যে, এবং ইন্টারভেনশন ও কন্ট্রোল গ্রুপের মধ্যে মানসিক বিকাশ ছিলো পি<০.০৫। তবে ইন্টারভেনশন এবং পর্যাপ্ত পুষ্টিসমৃদ্ধ গ্রুপের মধ্যে এ-বিকাশ তাৎপর্যপূর্ণ ছিলো না

বেজলাইন থেকে চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত: মানসিক বিকাশ পর্যাপ্ত পুষ্টিসমৃদ্ধ গ্রুপে ছিলো পি<০.০৫, কন্ট্রোল গ্রুপে পি<০.০০১ এবং ইন্টারভেনশন গ্রুপে তা তাৎপর্যপূর্ণ ছিলো না

আচরণ পর্যবেক্ষণের জন্য পাঁচটি রেটিং-এর মধ্যে ইন্টারভেনশন গ্রুপের চারটিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা গেছে। এগুলো হলো– পরীক্ষা গ্রহণকারীর প্রতি সাড়া অর্থাৎ বন্ধুত্বসুলভ আচরণ (বি ± এসই, পি=০.৪৮ ± ০.১৫, <০.০১), আবেগ (০.৩১ ± ০.১৫, <০.০৫), সহযোগিতা (০.৪১ ± ০.১৬, <০.০১), এবং কথা বলায় সাবলীলতা (০.৪৫ ± ০.২৩, <০.০৫)। কিন্তু তাদের

নড়াচড়ার ওপর কোনো ফলাফল পরিলক্ষিত হয় নি।

গবেষণার শেষে শিশুদের সামাজিক অবস্থার বৈষম্য পরীক্ষা করার পর পর্যাপ্ত পুষ্টিসমৃদ্ধ শিশুদের সাথে ইন্টারভেনশন এবং কন্ট্রোল গ্রুপের পুষ্টিহীন শিশুদের কোনো পার্থক্য ছিলো কি না তা দেখার জন্য 'মাল্টিপল রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস' দ্বারা আমরা পুনরায় আরো কিছু পরীক্ষা সম্পন্ন করেছি। গবেষণার শেষে দেখা গেছে যে, পর্যাপ্ত পুষ্টিসমৃদ্ধ শিশুদের তুলনায় কন্ট্রোল গ্রুপের পুষ্টিহীন শিশুদের মানসিক এবং মটরের বিকাশ উল্লেখযোগ্যভাবে কম (যথাক্রমে বি ± এসই, পি=-৫.১ ± ২.০, <০.০৫, এবং -৬.৫ ± ২.৩, <০.০১), তারা অনেক কম সহযোগিতামূলক আচরণ করেছে (-০.৫৪ ± ০.১৭, <০.০১), কথা-বার্তা বলায় কম সাবলীল ছিলো (-০.৭ ± ০.২, <০.০১) এবং তাদের মধ্যে অস্থিরতা ছিলো বেশি (-০.৬ ± ০.১৬, <০.০১)। তাদের মধ্যে বন্ধুত্বসুলভ প্রবণতাও কম দেখা গেছে (-০.৩ ± ০.১৬, <০.১)। অন্যদিকে পর্যাপ্ত পুষ্টিসমৃদ্ধ শিশুদের থেকে ইন্টারভেনশন গ্রুপের পুষ্টিহীন শিশুদের মধ্যে মটর বিকাশের বিষয়টি ব্যতিরেকে অন্যান্য বিষয়ে তেমন কোনো পার্থক্য দেখা যায় নি।

চিত্র ২: মূল্যায়নের সময় তিনটি গ্রুপের শিশুদের সাইকোমটর বিকাশের সূচি (পিডিআই)

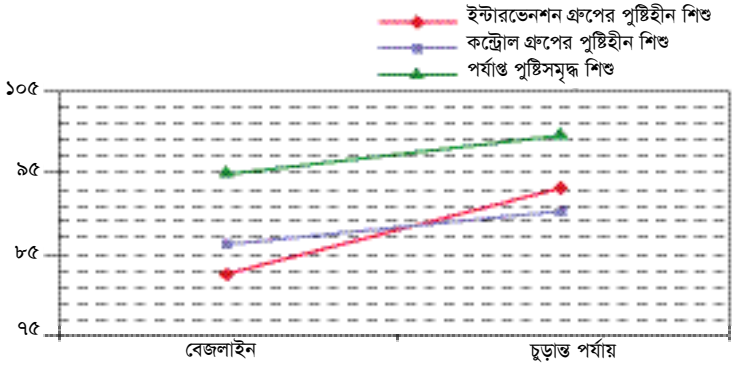

বেজলাইন: পর্যাপ্ত পুষ্টিসমৃদ্ধ এবং পুষ্টিহীন গ্রুপসমূহের মধ্যে যৌথভাবে সাইকোমটরের বিকাশ ছিলো পি<০.০০১ এবং দু'টি পুষ্টিহীন গ্রুপের মধ্যে তা তাৎপর্যপূর্ণ ছিলো না

চূড়ান্ত পর্যায়: সাইকোমটরের বিকাশ কন্ট্রোল ও পর্যাপ্ত পুষ্টিসমৃদ্ধ গ্রুপের মধ্যে ছিলো পি<০.০১ এবং ইন্টারভেনশন ও কন্ট্রোল গ্রুপের মধ্যে পি=০.১। ইন্টারভেনশন এবং পর্যাপ্ত পুষ্টিসমৃদ্ধ গ্রুপের মধ্যে এ-বিকাশ তাৎপর্যপূর্ণ ছিলো না

বেজলাইন থেকে চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত: সাইকোমটরের বিকাশ পর্যাপ্ত পুষ্টিসমৃদ্ধ গ্রুপে ছিলো পি<০.০৫, ইন্টারভেনশন গ্রুপে <০.০০১ এবং কন্ট্রোল গ্রুপে পি=০.০৭

প্রতিবেদক: চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট ইউনিট, ক্লিনিক্যাল সায়েন্সেস ডিভিশন, আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকুল্য: বিশ্ব ব্যাংক এবং ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট, ইউকে

মন্তব্য

পুষ্টিহীন শিশুদের নিয়ে গঠিত একটি ইন্টারভেনশন কর্মসূচির মাধ্যমে মায়েদের দ্বারা শিশুদের মধ্যে মানসিক-সামাজিক উদ্দীপনা জাগ্রত করে তাদের মানসিক বিকাশের হ্রাস উল্লেখযোগ্যভাবে রোধ

করা সম্ভব হয়েছে। যদিও সবগুলো গ্রুপেরই মানসিক বিকাশ হ্রাস পেতে দেখা গেছে, অন্য দু'টি গ্রুপের তুলনায় ইন্টারভেনশন গ্রুপে এটি কম হ্রাস পেয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, দরিদ্র শিশুদের মধ্যে যারা গতানুগতিক সমাজে বড়দের সাথে একটি সহায়ক পরিবেশে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে, জীবনের প্রথম বছরে তাদের মানসিক বিকাশ ভাল হয়। বড় হওয়ার সাথে সাথে এই পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রায়ই কমে যায় এবং ফলে জীবনের পরবর্তী বছরগুলোতে তাদের মানসিক বিকাশ কমতে দেখা যায় (১০-১১)। বাংলাদেশী একটি গবেষণায়ও শিশুদের এসব বিকাশ কমে যেতে দেখা গেছে যেখানে কিছু শহুরে শিশুদের বিকাশ পরিমাপ করা হয়েছে তাদের সাত এবং ১৩ মাস বয়সের সময় (১২)।

শিশুদের জন্য তাদের সাইকোমটরের বিকাশ উপকারী বলা হলেও এর পরিসংখ্যানগত তাৎপর্য দেখা যায় নি। কিন্তু পুষ্টি-সংক্রান্ত অবস্থা যখন কন্ট্রোল করা হয়েছে, তখন সাইকোমটর বিকাশের ওপর ইন্টারভেনশনের ফলাফল বেশি দেখা গেছে। সম্ভবত ক্রমাগত পুষ্টিহীনতার কারণে সাইকোমটরের বিকাশ ছিলো তুলনামূলকভাবে কম। পূর্ববর্তী গবেষণায়ও দেখা গেছে যে, শিশুদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারলে তাদের বুদ্ধির বিকাশ ভাল হয় এবং লেখাপড়ায়ও তারা ভাল করে (৩,৪,১৩)। তবে এর দ্বারা মটর বিকাশের ক্ষেত্রে তেমন কোনো প্রভাব পড়ে না। উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে আচরণের চারটি ক্ষেত্রেও উন্নতি দেখা গেছে। কন্ট্রোল গ্রুপের পুষ্টিহীন শিশুদের তুলনায় ইন্টারভেনশনের অন্তর্ভুক্ত শিশুরা অধিকতর বন্ধুবৎসল, হাসি-খুশি ও সহযোগিতামূলক ছিলো এবং কথা বলায় ছিলো বেশি সাবলীল। পুষ্টিহীন শিশুরা ছিলো অধিকতর নির্জীব এবং কোনো কিছুর প্রতি তাদের তেমন কোনো আগ্রহ দেখা যায় নি। তাছাড়া পরিবেশ থেকে নতুন কিছু শিখতে তাদের মধ্যে অনীহা দেখা গেছে (২)। যেহেতু শিশুরা পরিবেশ থেকে নিজেদেরকে আলাদা করে রাখে এবং ফলশ্রুতিতে তাদের বুদ্ধি-বিকাশের সুযোগ কমে যায়, তাই শিশুদের এই আচরণকে বলা হয় 'ব্যবহারিক কাজ থেকে নিজেদেরকে আলাদা করে রাখা' (ফাংশনাল আইসোলেশন) (১৪)। অতএব আচরণ উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের বুদ্ধির আরো বিকাশ ঘটতে পারে।

এ-গবেষণা থেকে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশে পুষ্টিসেবা কার্যক্রমের মধ্যে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক উন্নয়ন-সংক্রান্ত কার্যাবলি অন্তর্ভুক্ত করে একটি সমন্বিত কর্মসূচি চালু করা সম্ভব এবং এর মাধ্যমে পুষ্টিহীন শিশুদের শারীরিক ও মানসিক উন্নয়ন সম্ভব। এ-উদ্দেশ্য সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য বর্তমানে চালু কার্যক্রমসমূহকে চালিয়ে নেওয়া উচিৎ এবং ভবিষ্যতে আরো বৃহৎ পরিসরে এই কলা-কৌশলসমূহ প্রয়োগের ব্যবস্থা করা উচিৎ।

তথ্যসূত্রের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন।

কাজের জন্য স্বামীর আলাদা বসবাসের ফলে বিবাহিত পুরুষ এবং মহিলাদের ঝুঁকিপূর্ণ যৌন-আচরণ

কাজের জন্য স্বামীর আলাদা বসবাসের ফলে বিবাহিত পুরুষ এবং মহিলাদের ঝুঁকিপূর্ণ যৌন-আচরণের বিস্তার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে এ-গবেষণা পরিচালিত হয়। বাংলাদেশের দু'টি গ্রামাঞ্চলে দৈবচয়নের (র‍্যানডমলি) ভিত্তিতে নির্বাচিত ১,১৭৫ জন মহিলা এবং ৭০৩ জন পুরুষের মধ্যে একটি ক্রস-সেকশনাল সমীক্ষা চালানো হয়। যেসব বিবাহিত পুরুষ তাদের স্ত্রী থেকে আলাদাভাবে বাংলাদেশের কোথাও অথবা বিদেশে অবস্থান করেছেন তাদের মধ্যে বিয়ে-বহির্ভূত যৌনমিলন হয়েছে তাদের থেকে পাঁচ-ছয়গুণ বেশি যারা স্ত্রী থেকে আলাদা বসবাস করেন নি: অ্যাডজাস্টেড অডস্ রেশিও যথাক্রমে ৪.৬ (৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল: ২.৯-৭.৩), এবং ৬.০ (৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল: ৩.৯-৯.৩)। যেসব বিবাহিত পুরুষ তাদের স্ত্রীর কাছ থেকে আলাদা বাংলাদেশের কোথাও অথবা বিদেশে অবস্থান করেছেন, তাদের প্রায় অর্ধেক কোনো না কোনো যৌনকর্মীর সাথে যৌনমিলন করেছেন। এসব পুরুষের এক-তৃতীয়াংশেরও কম তাদের স্ত্রীর সাথে অথবা বিয়ে-বহির্ভূত যেকোনো যৌনমিলনের সময় কনডম ব্যবহার করেছেন। বিবাহিত যেসব পুরুষ বাড়ির বাইরে অবস্থান করেছেন, তাদের ঝুঁকিপূর্ণ যৌন-আচরণ তাদেরকে এইচআইভি-সংক্রমণের ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয় এবং তা বাংলাদেশে এইচআইভি বিস্তারের একটি সম্ভাব্য পথ তৈরি করে।

বর্তমানে এইচআইভি-র হার খুব কম (<১%) থাকলেও বাংলাদেশের জনগণ এইচআইভি মহামারীর ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। যৌনকর্মী, ইনজেকশনের মাধ্যমে শিরায় মাদক-গ্রহণকারী এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির মধ্যে পরিচালিত সেরো-সার্ভিলেন্স-এর পারস্পরিক রাউন্ডগুলোর মধ্যে এইচআইভি রোগী পাওয়া গেছে (১)। আচরণগত বাৎসরিক সার্ভিলেন্স থেকে জানা যায় যে, এখানকার ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির আচরণ অন্ততঃপক্ষে এশিয়ার দেশগুলোর মতো যেখানে কনসেনট্রেটেড মহামারী বিরাজমান। ইতোমধ্যেই এ-সংক্রান্ত মহামারী প্রতিবেশি রাষ্ট্র মিয়ানমার, নেপাল এবং ভারতের কিছু অংশের দিকে অগ্রসর হয়েছে, যেখানে এইচআইভি-সংক্রমণ পুরুষদের যৌনসম্পর্কিত ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ, যৌন-ব্যবসা, ইনজেকশনের মাধ্যমে শিরায় মাদক-গ্রহণ এবং কাজের জন্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার সাথে সম্পর্কিত (৩)।

যেসব দেশে এইচআইভি-র ব্যাপকতা অনেক বেশি, সেসব দেশে ঝুঁকিপূর্ণ যৌন-আচরণে নিয়োজিত থাকার পর যারা এইচআইভির ব্যাপকতা যেসব দেশে কম সেখানে ফিরে আসেন, তাদের মাধ্যমে এসব দেশে এইচআইভির বিস্তার লাভ করতে পারে এবং হতে পারে বিভিন্ন উপায়ে এইচআইভি ছড়ানোর এটি একটি উপায়। আইসিডিডিআর,বি-র তিনটি ভলান্টারি কাউন্সেলিং অ্যান্ড টেস্টিং ইউনিট থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে জানা যায় যে, ২০০২ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত পরীক্ষিত ২৫৯ জনের মধ্য থেকে ৪৭ জনের (১৮.১%) মধ্যে এইচআইভির জীবাণু পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে ২৯ জন ছিলেন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ যারা বিদেশ থেকে ফেরত এসেছেন, সাতজন ছিলেন বাড়ি থেকে দূরে কর্মরত লোকের স্ত্রী, এবং চারজন ছিলেন বাড়ি থেকে দূরে কর্মরত এইচআইভি আক্রান্তদের শিশু (৪)। গত দশকে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ২০০,০০০ লোক প্রতি বছর কাজের জন্য বিদেশে গেছেন বলে রেকর্ড করা হয়েছে, যাদের অধিকাংশই মধ্যপ্রাচ্যে গেছেন। উল্লিখিত জনসংখ্যার থেকে অনেক বেশি লোক বিভিন্নভাবে বিদেশে গেছেন যার কোনো হিসেব নেই (৫)। স্বামী-স্ত্রীর আলাদাভাবে বসবাস করা এবং এর সাথে তাদের ঝুঁকিপূর্ণ যৌন-আচরণের যে সম্পর্ক তার ওপর ইতোপূর্বে কোনো উপাত্ত প্রকাশিত হয় নি।

এ-গবেষণার উদ্দেশ্য ছিলো বিবাহিত মানুষের মধ্যে যারা স্বামী বা স্ত্রী থেকে আলাদাভাবে বাড়ি থেকে দূরে বসবাস করেছেন তাদের ঝুঁকিপূর্ণ যৌন-আচরণের সাথে যারা (বিবাহিত) আলাদা

বসবাস করেন নি তাদের ঝুঁকিপূর্ণ যৌন-আচরণের তুলনা করা। মহিলাদের ক্ষেত্রে তাদেরকে রেফারেন্ট গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যারা কমপক্ষে পাঁচ বছর তাদের স্বামী থেকে আলাদা বসবাস করেন নি। অন্য শ্রেণীর মধ্যে সেসব মহিলাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যাদের স্বামী বাড়ি থেকে দুরে বাংলাদেশের কোথাও অবস্থান করেছেন এবং বিদেশে ছিলেন। পুরুষদের ক্ষেত্রে যারা তাদের স্ত্রীর সাথে কমপক্ষে পাঁচ বছর বাড়িতে বসবাস করেছেন তাদেরকে রেফারেন্ট গ্রুপ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। অন্যশ্রেণীর মধ্যে ছিলেন সেসব পুরুষ যারা তাদের স্ত্রী থেকে আলাদা বাংলাদেশের কোথাও এবং বিদেশে বসবাস করার পর ফিরে এসেছেন।

আইসিডিডিআর,বি পরিচালিত দু'টি এলাকার স্বাস্থ্য ও জনমিতি-সংক্রান্ত সার্ভিলেন্সের ডাটাবেজে রক্ষিত ১১,০০০ বিবাহিত মহিলার মধ্য থেকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে ১,১৭৫ জন বিবাহিত মহিলা এবং ৭০৩ জন বিবাহিত পুরুষের ওপর আমরা একটি সমীক্ষা পরিচালনা করেছি। এসব এলাকার (এলাকা ক খুলনা বিভাগে এবং এলাকা খ চট্টগ্রাম বিভাগে) মধ্য থেকে সংখ্যা অনুযায়ী আনুপাতিক হারে প্রতিটি গ্রুপের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। প্রত্যেক শ্রেণীর কতজনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ শেষ হয়েছে এবং শতকরা কতজন উত্তর দিয়েছেন তা সারণি ১-এ সন্নিবেশিত হয়েছে। উত্তরদাতাদের শতকরা হার ছিলো ৬৯-৯০। উত্তর না দেওয়ার প্রধান কারণ ছিলো সাময়িক অনুপস্থিতি এবং অসুস্থতা। মাত্র তিনজন সাক্ষাৎকার দিতে সম্মত হন নি। বয়স, বিবাহিত জীবন, শিক্ষা, পারিবারিক খরচ এবং বসবাসের এলাকাকে নিয়ন্ত্রণ করে অ্যাডজাস্টেড অডস্ রেশিওর (বিভিন্ন বিষয়ের এক্সপোজার/নন-এক্সপোজার) মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ যৌন-আচরণের তুলনা করা হয়েছে।

সারণি ১: সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য দৈবচয়নেরভিত্তিতে নির্বাচিত বিবাহিত মহিলা ও পুরুষের সংখ্যা, সম্পন্ন হওয়া সাক্ষাৎকার এবং উত্তরের শতকরা হার

কাজের জন্য বাড়ির বাইরে যাওয়া বিভিন্ন দল	নির্বাচিত নমুনা এবং বর্তমানে সঠিক শ্রেণীতে অবস্থান	অনুপস্থিত/ অসুস্থের সংখ্যা	সম্পন্ন হওয়া সাক্ষাৎকারের সংখ্যা (% উত্তর)
বিবাহিত মহিলা (১৫-৪৯ বছর)			
স্বামী থেকে আলাদা বসবাস করেন নি	৪৯৯	৯৮	৩৯৬ (৭৯.৪%)
স্বামী বর্তমানে বাড়ি থেকে দূরে বাংলাদেশে অবস্থান করছেন	৫৩৩	১৬৩ (২)*	৩৬৮ (৬৯.০%)
স্বামী বর্তমানে বিদেশে আছেন	৫৪৫	১৩১	৪১১ (৭৫.৪%)
বিবাহিত মহিলাদের (১৫-৪৯ বছর) স্বামী			
স্ত্রী থেকে আলাদা বসবাস করেন নি	৫২১	১১৪	৪০৭ (৭৮.১%)
বাংলাদেশের কর্মস্থল থেকে বাড়িতে ফিরে এসেছেন	১৫৪	৩৭	১১৭ (৭৬.০%)
বিদেশ থেকে ফিরে এসেছেন	১৯৯	১৯ (১)*	১৭৯ (৮৯.৯%)

*সাক্ষাৎকারদানে অসম্মতি জানিয়েছেন

যেসব লোক বিদেশ থেকে ফিরে এসেছেন তারা সংযুক্ত আরব আমিরাত (৩৫%), ওমান (১৬%), সৌদি আরব (১৬%), কুয়েত (১১%), পাকিস্তান (৮%), মালয়েশিয়া (৬%) এবং ভারতে (৩%) কাজ করেছেন। যেসব লোক বাড়ি থেকে দূরে বাংলাদেশের কোথাও ছিলেন তারা কাজ করেছেন চট্টগ্রাম, ঢাকা অথবা খুলনা বিভাগে, বিশেষ করে বন্দর নগরী চট্টগ্রাম (৪৩%) এবং রাজধানী ঢাকায় (১৯%)।

যেসব পুরুষ বাংলাদেশের অন্য কোথাও স্ত্রী থেকে দূরে বসবাস করেছেন তাদের অর্ধেকেরও বেশি (৫৯.৮% [৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল: ৫০.৯-৬৮.৭] এবং যারা বিদেশে ছিলেন তাদের দুই-তৃতীয়াংশ (৬৭.০% [৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল: ৬০.১-৭৩.৯]) বিয়ের পর স্ত্রী বাদে অন্য কারো সাথে যৌনমিলনের কথা জানিয়েছেন এবং এই হার তাদের থেকে আনুপাতিক হারে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি ছিলো, যারা তাদের স্ত্রী থেকে আলাদা বসবাস করেন নি (২৫.৬% [৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল: ২১.৪-২৯.৮])। দু'টি গবেষণা এলাকায় বিয়ে-বহির্ভূত যৌনমিলনের হার ছিলো একই রকম (সারণি ২)। 'মাল্টিপল লজিস্টিক রিগ্রেশন এনালাইসিস'-এর মাধ্যমে সামাজিক-জনমিতিক বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করে দেখা যায় যে, যেসব পুরুষ বাড়ি থেকে দূরে বাংলাদেশের কোথাও অথবা বিদেশে বসবাস করেছেন তাদের মধ্যে বিয়ে-বহির্ভূত যৌনমিলনের সম্ভাবনা ছিলো পাঁচ থেকে ছয়গুণ বেশি: অ্যাডজাস্টেড অডস্ রেশিও যথাক্রমে ৪.৬ (৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল: ২.৯-৭.৩) এবং ৬.০ (৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল: ৩.৯-৯.৩)।

সারণি ২: বাংলাদেশের দু'টি গ্রামীণ এলাকার পুরুষদের বিয়ে-বহির্ভূত যৌনমিলন

সমীক্ষা এলাকা	পুরুষদের যৌনমিলনের শতকরা হার (৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল) যারা স্ত্রী থেকে আলাদা বসবাস করেন নি (রেফারেন্ট গ্রুপ)	যারা বাংলাদেশের কর্মস্থল থেকে বাড়িতে ফিরে এসেছেন	যারা বিদেশ থেকে বাড়িতে ফিরে এসেছেন
যেকোনো সঙ্গীর সাথে যৌনমিলন	(সংখ্যা=২০১)	(সংখ্যা=৯২)	(সংখ্যা=১৬৪)
এলাকা ক (চট্টগ্রাম বিভাগ)	২৭.৯ (২১.৭-৩৪.১)	৫৮.৭ (৪৮.৬-৬৮.৮)*	৬৭.১ (৫৯.৯-৭৪.৩)*
	(সংখ্যা=২০৬)	(সংখ্যা=২৫)	(সংখ্যা=১৫)
এলাকা খ (খুলনা বিভাগ)	২৩.৩ (১৭.৫-২৯.১)	৬৪.০ (৪৫.২-৮২.৮)*	৬৬.৭ (৪২.৮-৯০.৬)*

*রেফারেন্ট গ্রুপের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি (৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল ওভারল্যাপ করে নাই)

পুরুষরা বাড়ি থেকে দূরে বসবাস করার সময় পূর্বের (দূরে বসবাস করার আগে) তুলনায় দু'থেকে তিনগুণ বেশি কোনো মহিলা যৌনকর্মীর সাথে যৌনমিলন করেছেন (পি <০.০৫) (সারণি ৩)। কাজের জন্য বাড়ি থেকে দূরে অবস্থানকারী পুরুষদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক বলেছেন যে, বাংলাদেশের কোথাও (৪৬.১% [৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল: ৩৭.১-৫৫.১]) অথবা বিদেশে (৫৩.৬% [৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল: ৪৬.৩-৬০.৯]) অবস্থানকালে তারা কোনো যৌনকর্মীর সাথে যৌনমিলন করেছেন। এদের মধ্যে সাতজন (৩.৯%) বাংলাদেশে ফিরে আসার পর যৌনকর্মীর সাথে যৌনমিলনের কথা জানিয়েছেন (গত ১২ মাসের মধ্যে)।

যেসব বিবাহিত পুরুষ তাদের স্ত্রীর সাথে আলাদা বসবাস করেন নি, তাদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কম পুরুষ বিয়ের পরে অন্য পুরুষের পায়ু-পথে যৌনকর্ম করেছেন (২.৫% [৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল: ১.০-৪.০])। যারা বাড়ি থেকে দূরে বালাদেশের কোথাও (৮.৫% [৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল: ৩.৪-১৩.৬]) অথবা বিদেশে (৬.১% [৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল: ২.৬-৯.৬)] বসবাস করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি পুরুষ কোনো পুরুষের সাথে যৌনকর্ম করেছেন বলে জানিয়েছেন।

সারণি ৩: যৌথভাবে দু'টি গবেষণা এলাকার পুরুষকর্তৃক কোনো মহিলা যৌনকর্মী অথবা অন্য পুরুষের সাথে যৌনমিলন

বিয়ে-বহির্ভূত যৌনমিলনের সময়কাল	পুরুষের শতকরা হার (৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল) যারা স্ত্রী থেকে আলাদা বসবাস করেন নি (রেফারেন্ট গ্রুপ) সংখ্যা=৪০৭	যারা বাংলাদেশের কর্মস্থল থেকে বাড়িতে ফিরে এসেছেন সংখ্যা=১১৭	যারা বিদেশ থেকে বাড়িতে ফিরে এসেছেন সংখ্যা=১৭৯
মহিলা যৌনকর্মীর সাথে যৌনমিলন			
বিয়ের পর থেকে (সকল পুরুষ)	১৫.২ (১১.৭-১৮.৭)	৪৯.৬ (৪০.৫-৫৮.৭)**	৫৮.৭ (৫১.৫-৬৫.৯)**
স্ত্রীর কাছ থেকে আলাদা বসবাসের আগে	-	১৩.৭ (৭.৫-১৯.৯)	২৩.৯ (১৭.৭-৩০.১)
স্ত্রীর কাছ থেকে আলাদা বসবাসের সময়	-	৪৬.১ (৩৭.১-৫৫.১)	৫৩.৬ (৪৬.৩-৬০.৯)
শুধুমাত্র পুরুষের সাথে যৌনকর্ম			
বিয়ের পর থেকে (সকল পুরুষ)	২.৫ (১.০-৪.০)	৮.৫ (৩.৪-১৩.৬)*	৬.১ (২.৬-৯.৬)*
স্ত্রীর কাছ থেকে আলাদা বসবাসের আগে	-	১.৭ (০.০-৪.০)	২.৮ (০.৪-৫.২)
স্ত্রীর কাছ থেকে আলাদা বসবাসের সময়	-	৭.৬ (২.৮-১২.৪)	৩.৯ (১.১-৬.৭)

* রেফারেন্ট গ্রুপের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি (পি<০.০৫)

**রেফারেন্ট গ্রুপের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি (৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল ওভারল্যাপ করে নি)

পুরুষদের তুলনায় কম মহিলা বিয়ে-বহির্ভূত যৌনমিলনের কথা জানিয়েছেন এবং এ-সংখ্যা যারা স্বামীর কাছ থেকে আলাদা বসবাস করেন নি তাদের (৩.০% [৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল: ১.৩-৪.৭]) তুলনায় যাদের স্বামী কাজের জন্য বাড়ি থেকে দূরে বাংলাদেশের কোথাও (১০.৬% [৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল: ৭.৫-১৩.৭]) অথবা বিদেশে (৬.৮% [৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল: ৪.৪-৯.২]) অবস্থান করেছেন, তাদের মধ্যে বেশি (পি<০.০৫) ছিলো। মাল্টিপল লজিস্টিক রিগ্রেশন এনালাইসিস থেকে জানা যায় যে, যেসব মহিলার স্বামী বাড়ি থেকে দূরে অবস্থান করেছেন তাদের মধ্যে বিয়ে-বহির্ভূত যৌনমিলন রেফারেন্ট গ্রুপ থেকে সম্ভবত প্রায় চারগুণ বেশি ছিলো। যেসব মহিলার স্বামী বাড়ি থেকে দূরে বাংলাদেশের কোথাও (অ্যাডজাস্টেড অডস্ রেশিও ৪.০ [৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল: ২.০-৭.৯]) এবং বিদেশে অবস্থান করেছেন (অ্যাডজাস্টেড অডস্ রেশিও ৩.৬% [৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল: ১.৫-৮.৯]) তাদের সকলের সামাজিক-জনমিতিক বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করে দেখা গেছে যে, উল্লিখিত মহিলাদের বিয়ে-বহির্ভূত যৌনমিলন ছিলো পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

স্বামী এবং স্ত্রীর আলাদা বসবাসের সময়কাল তাদের বিয়ে-বহির্ভূত যৌনমিলনের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়, যেখানে অধিকতর বেশি সময় ধরে আলাদা বসবাস করার সাথে ঝুঁকি বৃদ্ধির সম্পর্ক রয়েছে। মাল্টিপল লজিস্টিক রিগ্রেশন এনালাইসিস থেকে জানা যায় যে, যেসব পুরুষ তাদের স্ত্রী থেকে আলাদা বাংলাদেশের কোথাও কমপক্ষে ছয় মাস অথবা বিদেশে কমপক্ষে চার বছর বসবাস করেছেন তাদের বিয়ে-বহির্ভূত যৌনমিলন, যারা স্ত্রী থেকে আলাদা কোথাও বসবাস করেন নি তাদের থেকে সম্ভবত আটগুণ বেশি ছিলো: অ্যাডজাস্টেড অডস্ রেশিও যথাক্রমে ৮.২% [৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল: ৩.৮-১৭.৮] এবং ৮.৫% [৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল: ৪.২-১৬.৮]। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে যেসব মহিলা তাদের স্বামী থেকে আলাদা বসবাস করেছেন তারাও

একইরকমভাবে উচ্চ ঝুঁকির মধ্যে ছিলেন (সারণি ৪)।

সারণি ৪: স্বামী-স্ত্রী পরস্পর থেকে আলাদা থাকার সময়কাল: বিবাহিত মহিলা এবং পুরুষদের বিয়ে-বহির্ভূত যৌনমিলনের (যেকোনো সঙ্গীর সাথে) অনুমিত আপেক্ষিক ঝুঁকির অ্যাডজাস্টেড অডস্ রেশিও

আলাদা বসবাসের সর্বোচ্চ সময়কাল	বিয়ে-বহির্ভূত যৌনমিলনের অনুমিত আপেক্ষিক ঝুঁকি: অ্যাডজাস্টেড অডস্ রেশিও [১] (৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল)	
	বাড়িতে ফিরে আসা বিবাহিত পুরুষ	বিবাহিত মহিলা (যাদের স্বামী বাড়ি থেকে দূরে থাকেন)
	বাংলাদেশের অন্যত্র অবস্থান করার পর বাড়িতে ফিরে আসা পুরুষ	*বাড়ি থেকে দূরে বাংলাদেশে অবস্থানকারী স্বামী*
বাড়ির বাইরে অবস্থান করেন নি	১ (রেফারেন্ট)	১ (রেফারেন্ট)
তিন মাসের কম	২.৬ (১.৩-৫.৭)*	২.৪ (১.০-৫.৯)*
তিন-পাঁচ মাস	৪.১ (২.১-৮.১)*	২.৭ (১.১-৭.১)*
ছয়মাস বা তার বেশি	৮.২ (৩.৮-১৭.৮)*	৭.৪ (৩.৪-১৬.২)*
	বিদেশ থেকে ফিরে আসা পুরুষ	*স্বামী বিদেশে*
বাড়ির বাইরে অবস্থান করেন নি	১ (রেফারেন্ট)	১ (রেফারেন্ট)
২৫ মাসের কম	৪.১ (২.২-৭.৬)*	৩.১ (১.০-৯.৩)*
২৫-৪৮ মাস	৬.৭ (৩.৭-১২.৩)*	২.৫ (০.৯-৭.৮)*
৪৮ মাসের বেশি	৮.৫ (৪.২-১৬.৮)*	৬.১ (২.১-১৮.১)*

*৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেলের ভিত্তিতে ঝুঁকি বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে

[১] বয়স, বিয়ের সময়কাল, লেখাপড়া, মাসিক সাংসারিক খরচ এবং বসত-বাড়ির আয়তনের ওপর ভিত্তি করে

এক-তৃতীয়াংশেরও কম পুরুষ তাদের স্ত্রীর সাথে যৌনমিলনের সময় কনডম ব্যবহার করেছেন। এ-ব্যাপারে বাড়ি থেকে দূরে বসবাসকারীদের সাথে বাড়িতে বসবাসকারীদের পার্থক্য ছিলো খুব কম (২৮-৩০%)। যেসব পুরুষ বিয়ে-বহির্ভূত যৌনমিলন করেছেন তাদের মধ্যেও কনডম ব্যবহারকারীদের সংখ্যা বেশি নয়। বাংলাদেশের কোনো স্থান থেকে বাড়িতে ফিরে আসা পুরুষদের মধ্যে যারা বিয়ে-বহির্ভূত যৌনমিলনে লিপ্ত ছিলেন তাদের (১৬.৫%) মধ্যে কনডম ব্যবহারকারীর সংখ্যা, যারা বিয়ে-বহির্ভূত যৌনমিলন করেন নি (৪৩.৫%) তাদের থেকে কম ছিলো।

প্রতিবেদন: হেলথ সিস্টেমস অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেজ ডিভিশন, আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকুল্য: ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা

মন্তব্য

পুরুষদের দ্বারা বিয়ে-বহির্ভূত যৌনমিলন যদিও একটি সাধারণ ব্যাপার, তবে স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে বাংলাদেশে অথবা বিদেশে বসবাসকারী পুরুষদের মধ্যে এ-হার অনেক বেশি দেখা গেছে। মহিলাদের মধ্যেও যাদের স্বামী বাড়ি থেকে দূরে বসবাস করেছেন তাদের মধ্যে বিয়ে-বহির্ভূত যৌনমিলন বেশি দেখা গেছে। স্বামী-স্ত্রীর আলাদা বসবাসের মেয়াদকাল দীর্ঘ হওয়ার সাথে বিয়ে-বহির্ভূত যৌনমিলনের হার বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা গেছে। পুরুষদের তাদের স্ত্রীর কাছ থেকে

আলাদা বসবাস করার সময় এবং এর পূর্বের (যখন তারা তাদের স্ত্রীর সাথে একত্রে বসবাস করেছেন) বিয়ে-বহির্ভূত যৌনমিলনের তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আলাদা বসবাসের সাথে এই বিয়ে-বহির্ভূত যৌনমিলনের একটি সম্পর্ক রয়েছে। পুরুষদের ক্ষেত্রে স্ত্রীর সাথে একত্রে বসবাস করার সময়কাল অপেক্ষা আলাদা বসবাস করার সময় অন্য কোনো পুরুষের সাথে তাদের যৌনমিলনের সম্ভাবনা খুব বেশি দেখা গেছে এবং একইভাবে যৌনকর্মীর সাথে তাদের যৌনমিলনের সম্ভাবনা তিনগুণ বেশি দেখা গেছে (সারণি ৩)। বিদেশে থাকাকালীন সময়ে কোনো মহিলা যৌনকর্মীর সাথে যৌনমিলন করেছেন এমন পুরুষের সংখ্যা আনুপাতিক হারে অনেক বেশি ছিলো (৫৩.৬% [৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল: ৪৬.৩-৬০.৯])। আর এভাবে বিদেশ থেকে বাংলাদেশে এইচআইভি ছড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে।

জাতীয়ভাবে পরিচালিত সার্ভিলেন্সে বাংলাদেশে মহিলা যৌনকর্মীদের মধ্যে এইচআইভির সংক্রমণ দেখা গেছে (<১%), যদিও মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে যেখানে বাংলাদেশ থেকে অধিকাংশ পুরুষ কাজের জন্য যায়, সেখানে কর্মরত যৌনকর্মীদের মধ্যে এইচআইভি-সংক্রমণের বিস্তার সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। তবে বাড়ি থেকে দূরে অবস্থান করার পর ফিরে আসা পুরুষদের কাছ থেকে জানা যায় যে, তাদের মধ্যে আরো অনেকের এইচআইভি এবং যৌনবাহিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিয়ে এবং বিয়ে-বহির্ভূত উভয় যৌনমিলনের সময় পুরুষরা কনডম কম ব্যবহার করলে তা স্ত্রীর জন্য ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের কোথাও অথবা বিদেশে অবস্থানের সময় এক-তৃতীয়াংশেরও কম লোক কোনো যৌনকর্মীর সাথে যৌনমিলনের সময় কনডম ব্যবহার করেছেন। স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে অবস্থান করে থাকুন বা নাই থাকুন অথবা বিয়ে-বহির্ভূত যৌনমিলন করে থাকুন বা নাই থাকুন; মাত্র ৩০% বিবাহিত পুরুষ স্ত্রীর সাথে যৌনমিলনে কনডম ব্যবহার করেছেন।

দু'টি গবেষণা এলাকার পুরুষদের মধ্যে কাজের জন্য স্ত্রী থেকে আলাদা বসবাসকারী প্রায় অর্ধেক পুরুষ যেহেতু তাদের আলাদা বসবাসের সময় কোনো যৌনকর্মীর সাথে যৌনমিলন করেছেন এবং বেশিরভাগই কনডম ব্যবহার না করেই, সেহেতু এইচআইভি-সংক্রমণ-সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি করার জরুরি প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়া কাজের জন্য বাড়ি থেকে দূরে অবস্থানকারীদের জন্য এ-লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ইন্টারভেনশন কর্মসূচি চালু এবং তা মূল্যায়ন করাও অতীব প্রয়োজন।

তথ্যসূত্রের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন।

সর্বশেষ সার্ভিলেন্স

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা'র প্রতিসংখ্যায় পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রদত্ত সার্ভিলেন্স-বিষয়ক উপাত্তের হালনাগাদ তথ্য পরিবেশন করা হয়। এই হালনাগাদকৃত সারণি এবং চিত্রগুলোতে প্রকাশনাকালীন সময়ে প্রাপ্ত সর্বশেষ সার্ভিলেন্স কর্মসূচির তথ্যগুলো প্রতিফলিত হয়। আমরা আশা করছি, রোগ বিস্তারের বর্তমান ধরন এবং রোগের ওষুধ-প্রতিরোধ সম্পর্কে আগ্রহী স্বাস্থ্যগবেষকদের কাছে এই তথ্যগুলো সহায়ক হবে।

জীবাণুনাশক ওষুধের প্রতি ডায়রিয়া জীবাণুর সংবেদনশীলতার অনুপাত: ডিসেম্বর ২০০৪-নভেম্বর ২০০৫

জীবাণুনাশক ওষুধ	*শিগেলা* (সংখ্যা=২২৭)	*ভি. কলেরি* O১ (সংখ্যা=৯১৩)
ন্যালিডিক্সিক এসিড	৪০.৫	পরীক্ষা করা হয় নি
মেসিলিনাম	৯৯.৫	পরীক্ষা করা হয় নি
এম্পিসিলিন	৫৬.৮	পরীক্ষা করা হয় নি
টিএমপি-এসএমএক্স	৪১.৪	১.৪
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	১০০.০	১০০.০
টেট্রাসাইক্লিন	পরীক্ষা করা হয় নি	২৭.৮
ইরিথ্রোমাইসিন	পরীক্ষা করা হয় নি	৪০.৮
ফুরাজোলিডোন	পরীক্ষা করা হয় নি	০.৩

প্রতিমাসে প্রাপ্ত ভি. কলেরি O১, শিগেলা *এবং রোটাভাইরাস-এর তুলনামূলক চিত্র: ডিসেম্বর ২০০৪-নভেম্বর ২০০৫*

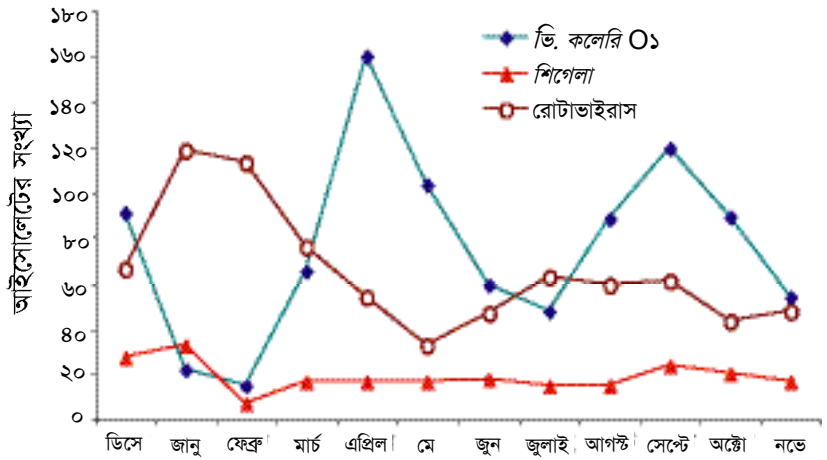

৭২টি এম. টিউবারকিউলোসিস *জীবাণুর ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ধরন: জানুয়ারি ২০০৪-আগস্ট ২০০৫*

ওষুধ	প্রতিরোধের ধরন		
	প্রাইমারি (সংখ্যা=৬০)	একোয়ার্ড * (সংখ্যা=১২)	মোট (সংখ্যা=৭২)
স্ট্রেপটোমাইসিন	২০ (৩৩.৩)	৪ (৩৩.৩)	২৪ (৩৩.৩)
আইসোনায়াজিড (আইএনএইচ)	৯ (১৫.০)	৩ (২৫.০)	১২ (১৬.৭)
ইথামবিউটল	৯ (১৫.০)	৩ (২৫.০)	১২ (১৬.৭)
রিফামপিসিন	১০ (১৬.৭)	৪ (৩৩.৩)	১৪ (১৯.৪)
এমডিআর (আইএনএইচ+রিফামপিসিন)	৩ (৫.০)	২ (১৬.৭)	৫ (৬.৯)
অন্যান্য ওষুধ	৩২ (৫৩.৩)	৭ (৫৮.৩)	৩৯ (৫৪.২)

( ) শতকরা হার *১ মাস বা তার চেয়ে বেশি সময় ধরে যক্ষার ওষুধ গ্রহণ করেছে

জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে এন. গনোরিয়া *জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৫ (সংখ্যা=১১)*

জীবাণুনাশক ওষুধ	সংবেদনশীল (%)	কম সংবেদনশীলতা (%)	রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা (%)
এজিথ্রোমাইসিন	১০০.০	০.০	০.০
সেফট্রিয়াক্সোন	১০০.০	০.০	০.০
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	৯.০	০.০	৯১.০
পেনিসিলিন	২৭.৩	৯.১	৬৩.৬
স্পেক্টিনোমাইসিন	১০০.০	০.০	০.০
টেট্রাসাইক্লিন	০.০	০.০	১০০.০
সেফিক্সিম	১০০.০	০.০	০.০

পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে স্ট্রেপটোকোক্কাস নিউমোনি *জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: মে-অক্টোবর ২০০৫*

জীবাণুনাশক ওষুধ	পরীক্ষিত (সংখ্যা)	সংবেদনশীল (%)	কম সংবেদনশীলতা (%)	রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা (%)
এম্পিসিলিন	২২	১০০	০	০
কোট্রাইমোক্সাজোল	২৫	১৬	১২	৭২
ক্লোরামফেনিকল	২৫	১০০	০	০
সেফট্রিয়াক্সোন	২৫	১০০	০	০
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	২৪	৯২	৮	০
জেন্টামাইসিন	২৫	১২	০	৮৮
অক্সাসিলিন	২৫	৯৬	০	৪

সূত্র: আইসিডিডিআর,বি এবং শিশু হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; স্যার সলিমুল্লাহ্ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; আইসিএইচ-শিশু স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন; চট্টগ্রাম মা-শিশু ও জেনারেল হাসপাতাল; ঢাকা শিশু হাসপাতাল; কুমুদিনি হাসপাতাল, মির্জাপুর এবং আইসিডিডিআর,বিকর্তৃক ঢাকার কমলাপুর ও টাঙ্গাইলের মির্জাপুর এলাকায় পরিচালিত নিউমোএডিআইপি সার্ভিলেন্সে অংশগ্রহণকারী শিশুদের থেকে সংগৃহীত।

আইসিডিডিআর,বি এবং এর যেসব দাতা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে কেন্দ্রের পরিচালনা এবং গবেষণার কাজে অর্থ সাহায্য করছে তাদের অর্থানুকুল্যে এইচএসবি-এর এ-সংখ্যাটি ছাপা হচ্ছে। বর্তমানে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে যারা অর্থ সাহায্য করছে তারা হলো: অস্ট্রেলিয়ান ইন্টারন্যশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (অসএইড), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ক্যানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা), সৌদি আরব, নেদারল্যান্ডস, শ্রীলংকা, সুইডিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেটিভ এজেন্সি (সিডা), সুইস ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন (এসডিসি) এবং ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি), ইউকে। আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে এসব দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহের সহায়তা এবং প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করছি।

ছবি : বাড়ি পরিদর্শনকালে মা, শিশু ও একজন প্রশিক্ষক একটি ছবির কার্ড দেখছেন
(সৌজন্যে - জেনা ডি. হামাদানী)

সম্পাদকমণ্ডলি	স্টিফেন পি. লুবি পিটার থর্প এম সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
সম্পাদনা বোর্ড	চার্লস পি লারসন এমিলি গারলী
যাঁরা লেখা দিয়েছেন	স্টিফেন পি. লুবি জেনা ডি. হামাদানী অ্যালেক মার্সার
কপি সম্পাদনা ও বাংলা অনুবাদ	এম সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
পেজ লে-আউট, ডেস্কটপ ও প্রি-প্রেস প্রসেসিং	মাহ্‌বুব-উল-আলম

আইসিডিডিআর,বি: সেন্টার ফর হেলথ্ অ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ
জিপিও বক্স নং ১২৮
ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ

এ-সংখ্যাটির পিডিএফ এবং পূর্ববর্তী সকল সংখ্যার পিডিএফ-এর জন্য আমাদের ওয়েব সাইট ভ্রমণ করুন:
www.icddrb.org/hsb